কবিতা ও অনুবাদ

ঊর্মিলা চক্রবর্তী

অনুবাদ আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় বলে স্বীকৃত, এবং সে এখন সৃষ্টিধর্মী রচনার বেশ কাছাকাছি জায়গা করে নিয়েছে। অনুবাদের কী ও কেন নিয়ে আজ অজস্র আলোচনা চলছে, আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে তৈরি হয়েছে অনুবাদতত্ত্ব বা অনুবাদ সম্বন্ধে নানা মতবাদ। আমি সেই তত্ত্ব আলোচনায় খুব একটা যেতে চাই না। কিন্তু অনুবাদক হিসেবে কবিতার অনুবাদ সম্বন্ধে আমার নিজের বেশ কিছু অতৃপ্তি রয়ে গেছে। তাছাড়া বাংলা ভাষায় কবিতা সচরাচর যেভাবে অনুবাদ হয় সে নিয়েও আমার কিছু সমস্যা ছিল। তার কিছু আলোচনাই এখানে করতে চাই এবং তা করতে গেলে কিছুটা তত্ত্বের ছায়া এসে পড়তে বাধ্য।

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ঠিক কবিতাকে তুলে আনা যায় না, এই মৌলিক কথাটা মেনে নিয়েই কবিতার অনুবাদ শুরু হয়। কারণ ধ্বনি কবিতার প্রাণ, যাকে ইংরেজিতে ওয়র্ড মিউজিক বা শব্দসঙ্গীত বলা হয়। দুটি ভাষায় প্রধান পার্থক্যই থাকে ধ্বনিগত, তাই কবিতা এক অর্থে অনুবাদের ঊর্ধ্বে। তাছাড়া একটা কথা আমার শিক্ষকরা ছাত্রাবস্থায় বারবার বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেকথা হচ্ছে এই যে কবিতা বিমূর্ত ধারণা বা চিন্তা নয়, কবিতা তার বিষয়বস্তু বা কন্টেন্ট নয়, কবিতা হল তার ফর্ম, বা গঠন যা একান্তভাবেই মূর্ত। ছাত্রাবস্থায় কথাটা খুব বেশি স্পষ্ট না হলেও এখন মনে হয় যে এর থেকে বড় সত্য আর নেই। কবিতা ঠিক যে রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসে সেই রূপটিই তার নিজস্বতা। কীটসের 'ওড টু অটাম'-এর প্রথম স্তবকে হেমন্তের শুরু থেকে দ্বিতীয় স্তবকে মধ্যসময় এবং তার পর শেষ স্তবকে শীতের শুরু। এই যে গঠন, এটিই অটাম ওড, অন্য কোনও বিন্যাসে তাকে ধরা যাবে না। এবং এই গঠন সৃষ্টি হয়েছে পরপর বিন্যস্ত কিছু ছবির মাধ্যমে, যে ছবিগুলি কবিতার প্রাণ। কবিতার বক্তব্য যে কবিতা নয় তা যে কোনও সার্থক কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। এই ছবি আর তার সঙ্গে কীটসের অসামান্য শব্দসঙ্গীত এই তো তাঁর হেমন্তের ছবি। সেই সঙ্গীতের সুর ও লয় ক্রমে পালটে যায় কবিতার পরিসরে যত হেমন্তের বয়স বাড়ে। সেই সঙ্গীত আর কীভাবে অন্য এক ভাষায় তুলে আনা সম্ভব?

কিন্তু অনুবাদ ছাড়া উপায় কী? যিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না তিনি কি কীটসের কবিতার মতো এমন অমূল্য সম্পদ যে পৃথিবীসাহিত্যে আছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকবেন? তা তো হয় না, আর তাই আমরা এক অসম্ভবকে সম্ভব করতেই পথে নামি। এবার আমি অনুবাদ সম্বন্ধে দুটি মূল চিন্তার কথা বলি, মোটামুটি যেখান থেকে আজকের দিনের অনুবাদতত্ত্বগুলি এসেছে। আমি বিশ শতকের গোড়ার দিকের দুজন পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের কথা বলি। একজন আই.এ.রিচার্ডস। রিচার্ডস 'প্র্যাকটিক্যাল

ক্রিটিসিজম'-এর যে ওয়র্কশপগুলি শুরু করেছিলেন নানা কবির কবিতা নিয়ে তাতে তিনি কবিতাকে কবির নাম, সময়, কৃষ্টি, সবকিছু থেকে আলাদা করে ছাত্রের কাছে তার ব্যাখ্যা চাইতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এইভাবে কবিতার 'মূল' বা কেন্দ্রিক পাঠে পৌঁছে যাবেন। এর অর্থ দাঁড়াল যে, যে কোনও কবিতার ক্ষেত্রে কবি, সময়, কৃষ্টি, পারিপার্শ্বিক, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও এক পাঠ আছে, ব্যাখ্যা দিয়ে যে 'সঠিক' পাঠে পৌঁছোন যায়! মনে রাখতে হবে, 'সঠিক' মানেই নিশ্চয় কোনও প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত! কোনও কবিতার সম্যক পাঠ সঠিকভাবে অনুধাবন করলে তবেই তাকে অন্য ভাষায় বা একই ভাষায় অন্য শব্দসমষ্টিতে প্রকাশ করা যাবে এমনটা ভাবলেও রিচার্ডস অবশ্য এই পাঠের জটিলতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং এর কিছুটা যে স্পষ্ট ও কিছুটা অনুক্ত, তার মধ্যে নানা ব্যঞ্জনার যে নানান স্তর আছে এটা স্বীকার করেছিলেন। তবু তাঁকে অনুসরণ করলে অনুবাদককে কোনও এক স্বীকৃত ভাবার্থের অনুসন্ধান করে একটি 'সঠিক' পাঠ আবিষ্কার করতে হয়। রিচার্ডসের বিশ্বাস ছিল যে কবিতার 'মানসিক অবস্থা' নিশ্চিতভাবে ধরতে পারলে তাকে অন্য বাক্যসমষ্টিতে প্রকাশ করা, তাকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ যথেষ্ট 'শিক্ষিত' মন কবিতার মূল অভিজ্ঞতাটুকু ধরে তার সঠিক মূল্যায়ন করে তাকে অনুবাদের মাধ্যমে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। অনুবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই 'মূল' অভিজ্ঞতার সন্ধান নিশ্চয় জরুরি, কিন্তু এই 'সঠিক পাঠ' ব্যাপারটাই গোলমেলে ঠেকে। তেমন কোনও পাঠ আদৌ সম্ভব কি না সেটাই খোলা প্রশ্ন।

উত্তরাধুনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আজ আর এমন কোনও সঠিক পাঠ আছে বলে কেউই মনে করতে পারেন না। রিচার্ডসের অবদান অস্বীকার না করেও মনে রাখতেই হয় যে তিনি কবি নন, নেহাৎই তাত্ত্বিক। কবিতার অনুবাদও তিনি করেননি, কেবল প্লাতোর অনুবাদ করেছিলেন। এজরা পাউন্ড একে কবি, তায় মডার্নিস্ট কবি। তিনি কবিতা বলতে এক সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম বুঝতেন, তাই কবিতার পাঠ নিয়ে তাঁর চিন্তা অনেক উন্মুক্ত এবং অন্ততঃ আমার পক্ষে অনেক বেশি গ্রহণীয়। কবিতার যে কোনও একক মৌলিক পাঠ থাকতে পারে যা তেমন কোনও শিক্ষিত মন উদ্ধার করতে পারে এমন কথা আজকের দিনে আমরা যেমন আর মানতে পারি না তেমনি পাউন্ডও মানতে পারেননি। অনুবাদ ব্যাপারে পাউন্ডের উদ্দেশ্য ছিল সব খুঁটিনাটির সম্যক ত্রুটিহীন প্রকাশে। প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্প, এমনকি খন্ডচিত্রও পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে প্রকাশ করার দিকে তিনি মনোযোগী ছিলেন। শব্দগুলিকে কেবল অন্য কোনও ভাবনা প্রকাশ করবার জন্য ব্যবহার করা সাদা-কালো সংকেত বলে না মনে করে তিনি তাদের যেন স্থপতির সৃষ্টি করা পাথরের উপর খোদাই শিল্পসৃষ্টি হিসাবে দেখতেন। সেই শব্দ ও চিত্রকে অনুবাদক যতদূর সম্ভব সততার সঙ্গে তাঁর রচনায় দ্বিতীয়বার মূর্ত করে তুলবেন, কোনও বিশেষ 'অর্থ' সম্বন্ধে চিন্তা না করে, এই ছিল এজরা পাউন্ডের অনুবাদ সম্বন্ধে ধারণা। এমনটা করলে নিশ্চয়ই মূল কবিতার যে বহুমুখিত্ব তার অনেকটাই বজায় থাকা সম্ভব। পাউন্ডের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করলে যে অনুবাদ পাই তা আমার মনে হয় যথার্থ অর্থে মূলানুগ। এমন অনুবাদই আমার মনে হয় আদর্শ অনুবাদ।

এবার আসি আধুনিক বাংলাভাষায় কবিতার অনুবাদের কথায়। হেমচন্দ্র বা রঙ্গলালের কথা ছেড়ে দিলে ইংরেজি এবং অন্য ইউরোপীয় ভাষার কবিতা রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট অনুবাদ করেছেন, তিনি সংস্কৃত থেকেও কিছু অনুবাদ করেছেন। তাঁর কথা আনছি এইজন্য যে তাঁর নির্দেশিত পথেই বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতার অনুবাদ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতেই হচ্ছে যে তাঁর অনুবাদ সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গি মেলাতে আমি সক্ষম নই। সংস্কৃত থেকে অনুবাদের সময় তিনি কালিদাসের কবিতার অনুবাদ করেন এইভাবে,

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোহয়মস্মিন্
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

মৃদু এ মৃগদেহে
মেরো না শর।
আগুন দেবে কে হে
ফুলের 'পর।

বলতে গেলে আক্ষরিক অনুবাদ, কিন্তু কালিদাসের কবিতার সুরটি কি খুঁজে পাওয়া গেল? মূল ভাষায় পংক্তিগুলির চলনের যে গাম্ভীর্য, যুক্তাক্ষর ব্যবহারে যে গাঢ় ধ্বনিবিন্যাস, তার সঙ্গে তুলনা করলে অনুবাদ একান্তই হালকা, এমনকি চপল মনে হয়। অত্যধিক তরল স্বরের ব্যবহার, যুক্তাক্ষরবর্জন ও হালকা ছন্দের চলনে ঋষির সাবধানবাণীর গভীরের প্রগাঢ় সুরটিই যায় হারিয়ে। আমার তো বিশেষ করে মনে হয় যে তৃতীয় পংক্তিতে হে কথাটির ব্যবহার বিশেষ করে ঋষিবাক্যের গুরুত্বের হানি করে। পুষ্প, বাণ ও অগ্নি তিনটিই বাংলা শব্দ বলে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে শ্রুতিসুখকর বাংলা লিরিকের ব্যবহার করেছেন, কারণ হয়তো তিনি ঠিক কালিদাসের অনুবাদ করতেই চাননি, অনুসৃজন করতে চেয়েছেন। এখানে আমরা কালিদাসের বক্তব্যটুকু পাই, কবিতা পাই না।

একইভাবে ইংরেজি কবিতার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বড় বেশি স্বাধীনতা নিয়েছেন। তিনি ডান-এর বিখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেছেন। 'For God's sake hold your tongue and let me love' পংক্তিটি তাঁর তরজমায় দাঁড়িয়েছে, 'দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর, ভালবাসিবারে দে আমারে অবসর'। এখানে অনুবাদ আরও ডুবল। ডানের কবিতার সোচ্চার যৌনতার উপরে রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিক প্রেমের প্রলেপ পড়ে গেল, কবিতাটি গেল হারিয়ে। ডানের ইউ কখনোই বহুবচন নয়, বাইরের কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা নয়, তা প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রেমিকের উক্তি। একটানা একাক্ষর শব্দের ব্যবহারের যে শারীরিক অভিঘাত, তাও অনুবাদে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেছে। কবিতার শব্দগুলির অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু কবিতাটি গেছে হারিয়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ সঠিক অর্থে মূলানুগ অনুবাদ করতে চাননি কখনোই। তাঁর সব অনুবাদ পড়লেই মনে হয় যে তিনি পুনর্সৃজন বা ট্রান্সক্রিয়েশন করেছেন, অনেকক্ষেত্রে মূল কবিতাকে উপেক্ষা করেও।

এরপর বুদ্ধদেব বসু এসে যখন মেঘদূত অনুবাদ করলেন তখন কিন্তু তিনি অন্য ধারায় অনুবাদ করলেন। তিনি মূল কবিতার আক্ষরিক অনুবাদের সঙ্গে তার মূল সুরটি, তার চলনের ধরনটি বিশ্বস্তভাবে বাংলায় এনে দিতে চাইলেন পাঠকের কাছে। তাঁর কথায়,

> আমি চেয়েছি রচনার ভাষা যতদূর সম্ভব বাংলা হোক এবং আধুনিক বাংলা। সেই সঙ্গে এটাতে সংস্কৃতের স্বাদও কিছু রাখতে চেয়েছি; সেইজন্য অম্বু, অম্বোজ, বলভি, দ্বিরদ, করভ প্রভৃত শব্দ — আধুনিক বাংলায় যা অপ্রচলিত — তাদের ব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত করিনি;

মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘ সমাসও ব্যবহার করেছেন, নিজেই বলছেন। তাঁর অনুবাদে যখন পড়ি,

> যখন আটমাস কাটল সে পাহাড়ে কান্তাবিরহিত কামুকের
> সোনার কঙ্কণ স্খলিত হয়ে তার শূন্য হল মণিবন্ধ

দেখল মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে
বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে

তখন নিশ্চয়ই মূল সংস্কৃত কাব্যের স্বাদ আমরা অনেকটাই পেয়ে যাই। আমার মনে হয় একেই আমরা প্রকৃত মূলানুগ অনুবাদ বলতে পারি, যেখানে মূলের আক্ষরিক অনুবাদের সঙ্গে তার চলন এবং সুরমূর্ছনার সবটুকু ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সংস্কৃত থেকে আক্ষরিক অনুবাদ যতটা সহজ ইংরেজি থেকে নিশ্চয়ই ততটা নয় কারণ বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সুগভীর যোগ তা তো ইংরেজি বা অন্য কোনও বিদেশি ভাষার সঙ্গে নেই। তবে সে চেষ্টা করা যায় না তা তো নয়, কিন্তু সেপথে অন্য বাঙালি কবিরা বিশেষ পা বাড়াননি। তার কারণ মনে হয় এই যে বুদ্ধদেব বসু নির্দেশিত পথ যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ অন্যের কবিতা নিয়ে এতটা পরিশ্রম করতে হয়তো চাননি, তিনি মোটামুটি অনুসৃজনের পথেই হেঁটেছেন, আর সেই পথই অন্যান্য বাঙালি কবিদেরও মনে ধরেছে। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও একই পথে হেঁটেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদকে প্রকৃত অর্থে মূলানুগ এবং যথার্থ অনুবাদ বলে মেনে নিলেও একটা কথা মানতেই হয় যে, যে কোনও অনুবাদেই কবিতা অনুবাদের যে মৌলিক সমস্যা সেটা অনেকটাই থেকে যায়। যে কোনও সৃষ্টিধর্মী রচনায় লেখকের একান্ত নিজস্ব কণ্ঠস্বর বক্তব্য, আঙ্গিক, অলঙ্কার ইত্যাদি সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। সেখানেই লেখকের অনন্যতা। সকলেই মানবেন যে কবিতার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি বিশেষভাবে সত্যি। সেই কণ্ঠস্বর যে শব্দসমষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করেছে অন্য কোনও ভাষায় অবিকল সেই শব্দসমষ্টিতে তাকে প্রকাশ করা অসম্ভব, তাই ধ্বনিব্যঞ্জনার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় আরও অনেক কিছু, ছন্দের বিশেষত্ব, বাকধারার বৈশিষ্ট্যগুলি, অনুপ্রাস ইত্যাদি ধ্বনিনির্ভর অলঙ্কার, অনেকসময় শব্দার্থের ব্যঞ্জনার উপর নির্ভরশীল কিছু অলঙ্কার, যেমন শ্লেষ, বক্রোক্তি বা কূটাভাস, এবং বিশেষ করে অনুষঙ্গ। প্রথমতঃ আগেই বলেছি, যতই চেষ্টা করা যাক, মূলের ধ্বনির পূর্ণ অভিঘাত অন্য ভাষায় ধরা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ শব্দানুষঙ্গ বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন, অন্য ভাষায় মূল কবিতার পুরো শব্দানুষঙ্গকে পাওয়া যায় না। কাক শব্দটিতে ভূষন্ডি কাকের যে অনুষঙ্গ তা বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় পাওয়া যাবে না। দুপুরে কাক ডাকার অমঙ্গলের ভাবনা ইংরেজি কবিতায় আসবে না, আবার পাশ্চাত্যে কাকের সঙ্গে কালো জাদু আর শয়তানের যে অনুষঙ্গ তা আমাদের কাকের ধারণায় নেই। আবার কাকের রূপ ধরে মৃত আত্মা পৃথিবীতে আসেন এ চিন্তাও বিদেশে নেই। প্রকৃতি কথাটির মধ্যে পুরুষ/প্রকৃতি বৈপরীত্যের যে ধারণা আমাদের দেশের চিন্তায় আছে তা ইংরেজি 'নেচার' কথাটির মধ্যে খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা। আমাদের 'সতী' শব্দটির মধ্যে সতীদাহ প্রথার যে অনুষঙ্গ তা ইংরেজি 'চেস্ট ওম্যান' কথাটির মধ্যে কোথায়? অনুষঙ্গ পরিবর্তন হলে কবিতার বহুমুখী ব্যঞ্জনায় পরিবর্তন আসে, তার অন্তর্নিহিত ভাবটুকু পুরোপুরি ধরা দেয় না।

এ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। নিজে অনুবাদ করতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যার মুখে পড়েছি একটু বলি। কিছু আফ্রিকান-আমেরিকান কবিতার অনুবাদ করেছি। সেই কবিতার কিছু বিশেষত্ব আছে। আফ্রিকান-আমেরিকান মানুষের পিছনে শতশত বছরের নির্যাতন, নিপীড়ন, অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের ইতিহাস। সমাজের নৃশংসতম মুখটি তাঁরা দেখেছেন। তাই কবিতা লিখতে বসে নরম সুরে গাছ ফুল পাখি নিয়ে ললিত ছন্দ তাঁদের আসে না। খুব চড়া এক প্রতিবাদের সুর অধিকাংশ কবিতায়। তাঁরা তাঁদের কবিতাকে প্রতিবাদী কবিতা বলেই অভিহিত করেছেন। আফ্রিকার উষ্ণরক্তের মানুষ তাঁরা, আমেরিকায় ক্রীতদাস জীবনের ভয়ঙ্কর ঋণাত্মক অভিজ্ঞতা তাঁদের

কঠিন, কঠোর করেছে। তাঁদের কণ্ঠস্বর চড়া, প্রতিবাদ প্রচন্ড। প্রতিবাদের সেই ঋজু ভাবটি বাংলার মতো কমনীয় সুললিত ভাষায় সম্যকভাবে প্রকাশ করা দুরূহ, এমনকি অসম্ভব কাজ। কিছুটা চেষ্টা করা যায় এইমাত্র।

দ্বিতীয় কথা এই যে এমন এক নিপীড়িত সমাজ থেকে যেসব কবি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, এমনকি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ অল্পশিক্ষিত কালো মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা ব্যবহার করেছেন। সেখানেও অনুবাদকের এক কঠিন পরীক্ষা। সাধ্যমতো চেষ্টা করা যায় মাত্র। কিন্তু অল্পশিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ একে তো পশ্চিম আফ্রিকার ভাষা থেকে পাওয়া অন্য এক বাক্যবন্ধের ধরন ইংরেজি ভাষায় এনে এক অদ্ভুত ধরনের বাক্য গঠন করে যা ইংরেজি ভাষার পক্ষে ভুল, অথবা সোজাসুজি ভুলভাল ইংরেজি বলে। সেই ভুল ভাষাকে অনুবাদে তুলে আনতে আমি সক্ষম হইনি। একটা উদাহরণ দিই। গোয়ান্ডোলিন ব্রুকসের একটি কবিতায় একট পংক্তি আছে, 'উই রিয়াল কুল'। এই বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ নেই বলে ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণের হিসাবে এটি ভুল, এবং অশিক্ষিত কালো মানুষেরা যেমন ইংরেজি বলেন, ঠিক তেমন। কিন্তু বাংলায় যখন এটি অনুবাদে দাঁড়ায় 'আমরা বিলকুল তৈরি', তখন ক্রিয়াপদ বর্জনে বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে কোনও ভুল থাকে না। এগুলো সমস্যা নিশ্চয়। এছাড়াও অনেক সময় স্বরবর্ণ বর্জন করে অদ্ভুত বানান লেখা হচ্ছে, কখনও বড় হাতের অক্ষর বাদ দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষার সঙ্গে সামান্যতম পরিচয় থাকলেই বোঝা যায় যে এগুলো বাংলা অনুবাদে তুলে আনা যায় না।

এমিলি ডিকিনসন অনুবাদে অন্য এক সমস্যা। তিনি যখন আত্মাকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে দেখেছেন তখন স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করছেন। স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম বাংলা ভাষায় কোথায় পাব? তাই 'দ্য সোল সিলেক্টস হার ওন সোসাইটি' অনুবাদে দাঁড়াল, 'আত্মা বেছে নেয় তার আপন সঙ্গী', কবির আত্মাকে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে দেখার মধ্যে যে প্রবল নারীবাদী উচ্চারণ, তা কোথায় হারিয়ে গেল। এছাড়া তিনি বেশ কিছু শব্দের উপর বিশেষ জোর দেবার জন্য বড়ো হাতের অক্ষর ব্যবহার করছেন, তাও অনুবাদকের হাতের বাইরে! সিলভিয়া প্ল্যাথ অনুবাদ করতে গিয়ে দেখেছি যে তাঁর কবিতা এত জটিল, তার অনুষঙ্গের ঘনত্ব এত বেশি, শব্দসঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিলেও এমন দুরূহ সব ছন্দের ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশেষত্ব দিয়েছে যে অনুবাদে তাকে সামান্যই ধরা যায়।

এত আলোচনার পর মনে হতেই পারে যে তবে অনুবাদ কেন? এ তো বিফল প্রচেষ্টা। কিন্তু যাঁরা মূলভাষায় কবিতাগুলি পড়তে পারবেন না তাঁদের জন্যই তো অনুবাদ। সবটা হয়তো পাওয়া গেল না, তবু একনিষ্ঠ অনুবাদক পূর্ণ সততার সঙ্গে সঠিক অর্থে যতদূর সম্ভব মূলানুগ অনুবাদ করলে কবিতার অনেকটাই তো পাওয়া যেতে পারে। যেটুকু পাওয়া যায় তাই বা কম কীসে?

ঊর্মিলা চক্রবর্তী : কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।